Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 115–121
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

আধুনিক ভারতের শিক্ষায় বিদ্যাসাগরের ভাবনা

প্রণব কুমার মাহাত
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: pranab.prl1991@gmail.com

Keyword
রেনেসাঁ, নারীশিক্ষা, সংস্কার, গণশিক্ষা, শিক্ষাদান, কর্মসংস্থান, আধুনিক, মূল্যায়ন, যুক্তিনির্ভর

Abstract
ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শিক্ষা সংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের কথা ভেবে ছিলেন। শিক্ষার উপর অধিক জোর দিয়ে নানা গঠনমূলক পরিকল্পনা নেন। বিদ্যালয় পাঠ্যের উপযোগী বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করার পাশাপাশি নারী শিক্ষার জন্য অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। তিনি প্রথম একমাত্র মানুষ বুঝেছিলেন যে নারীশিক্ষার দ্বারা বাঙালি জাতির অগ্রগতি সম্ভব। তাই নারী শিক্ষার উন্নতি সাধনে নারীদের জন্য পৃথক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তার নানা প্রতিফলন আমরা পাই তাঁর বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে। তৎকালিন সময়ে যেসব শিক্ষানীতির উপর জোর দিয়েছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন সেগুলির কাছে বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ঋণী।

Discussion
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হলেন বাংলার রেনেসাঁ যুগের একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি একাধারে ছিলেন একজন মহান শিক্ষক, লেখক, পন্ডিত, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ। তিনি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলতে)। তাঁর পিতা ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। তিনি ছিলেন একজন বড়ো মাপের শিক্ষাবিদ, অথচ তিনি তাঁর দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। বৃটিশ সরকারের নিকট প্রেরিত বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র গুলি ও শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যাবলীর দিকে ভালোভাবে তলিয়ে দেখলে তাঁর আধুনিক শিক্ষা সংক্রান্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকে বাংলাতে শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি যে সব নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেছিলেন, সেগুলির বিবর্তিত রূপ যেন ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর বিদ্যাসাগরের এই গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেই হয়তো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একদা বলেছিলেন-

> "বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে, পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতার কোনো সাধ্য নেই যে তাকে স্পর্শ করার।"[১]

আলোচনার বিষয়ের সত্যতা অন্বেষণের জন্য আমাদের বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার গুলিকে একটু গভীর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পরেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানে সমাজের উচ্চবর্ণের সন্তানেরাই শিক্ষা অর্জনের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছে। তিনি যেহেতু আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, বলে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথা মানতেন না। তাই তিনি যখন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, সেই সময় তিনি শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকারের দরজা সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিকট উন্মোচিত করেন। বাংলা তথা ভারতের উচ্চ শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এটি ছিল তাঁর এক বড়ো অবদান। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের জন্য এক নতুন পাঠক্রমের খসড়া রচনা করেন। তিনি এই খসড়াতে ২৬ ধরনের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গুলির মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করলে সহজেই বোঝা যাবে যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচীতে কীরূপ পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, লীলাবতী ও বীজগণিত যা প্রচলিত পাঠ্য তালিকায় ছিল তা যথেষ্ট প্রহেলিকাময়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনভাগের দুইভাগ সংস্কৃতের জন্য এবং একভাগ সময় ইংরেজি শিক্ষার জন্য দেওয়ার কথা বলেন। অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শন শ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি। অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ সময় ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা উচিত। তিনি আরো বলেন-

> "সমস্ত রকম দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল সেগুলি পড়ে যাতে তারা বুঝতে পারে কীভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদ খন্ডন করেছে। অর্থাৎ সব মতের দর্শন পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তৈরি হয়।"[২]

তাঁর নতুন পাঠ্যসূচীতে স্থান পেল ইংরেজি ভাষা, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ বিজ্ঞান, গ্রহ তত্ত্ব, অর্থনীতির মতো আধুনিক বিষয়গুলি। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সহজে সংস্কৃত শেখানোর জন্য তিনি যেমন 'উপক্রমনিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করলেন ঠিক, তেমনি সহজেই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শেখানোর জন্য রচনা করেন বাংলা গদ্য। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন যে,

> "মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা জনগণের মধ্যে পরিশ্রুত হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগর সৃষ্ট বাংলা গদ্য গণশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়ালো।"[৩]

পাঠক্রম পরিবর্তনের পাশাপাশি তিনি সংস্কৃত কলেজের মূল্যায়ন ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনেন। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়নের পদ্ধতি চালু করেন। এছাড়াও শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে উপস্থিত হওয়া ও বাড়ি যাওয়ার জন্য বেশ কিছু কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন।[৪] এর প্রতিফলন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কার গুলি করেছিলেন, ভারতের বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর তার গভীর প্রভাব পড়েছে। তাঁর এই সংস্কার গুলি আমাদের বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেগুলির নমুনা দিয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি—

১. জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি : জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি ২০০৫ ও শিক্ষার অধিকার আইনে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষায় সাম্যতা এই ধারণাটি বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতকেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা করেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা অর্জনে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে।

২. শিক্ষায় বেসরকারিকরনের প্রথম প্রয়াস : একবিংশ শতকে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি করণের প্রয়াস। অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বেসরকারি উদ্যোগের প্রেরণা দাতা হলেন

বিদ্যাসাগর। তিনি এই ধারণার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

৩. আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন : বর্তমান দিনে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় নবরূপে সংযোজিত হয়েছে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য সামমেটিভ ও ফরমেটিভ মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থায় সারাবছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করার সুবিধা রয়েছে। কিন্তু আজকের এই আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতির ধারণাটি বিদ্যাসাগর অনেক আগেই প্রয়োগ করেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর। তিনি শিক্ষার্থীদের সারাবছর ধরে সক্রিয় রাখার জন্য প্রতি মাসে আংশিক মূল্যায়ন ও বছরের শেষে সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আজকের এই আধুনিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা হল বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিশীলিত রূপ।

৪. **পাঠ্যসূচীর সরলীকরণ ও যুক্তিনির্ভর :** জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের না বুঝে কোনো বিষয়ে মুখস্ত করানোর পরিবর্তে আনন্দ সূচক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা যায়, এমন বিষয় গুলিকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। একই রকম ভাবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচীকে সরলীকরণ ও যুক্তিনির্ভর করেছিলেন এবং সংস্কৃতের মতো অপ্রাসঙ্গিক, জটিল বিষয় গুলিকে পাঠক্রম থেকে বাদ দিয়েছিলেন।[৫]

৫. মাতৃভাষায় শিক্ষাদান : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার না করে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপর জোর দিয়েছিলেন। পাশাপাশি অন্যান্য প্রাচ্যভাষার উপর গুরুত্বকেও তিনি এড়িয়ে যাননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছেলেদের সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট এর চাকরি দেওয়া হতো। তাই সংস্কৃত কলেজের ছেলেরাও উত্তীর্ণ হয়ে সময়োগ্যতার চাকরি চাইতো কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এবং তা অনুমোদনও হয়েছিলো। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিষয়টিকে কখনোই স্বীকার করেননি। এ বিষয়ে ঊনিশশতকের একজন বিশিষ্ট চিন্তক ও গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন-

> "সংস্কৃত কলেজটিকে তাই বিদ্যাসাগর সেকালের টোল চতুষ্পাঠী করতে চাননি। আবার তার সংলগ্ন হিন্দু কলেজের মত দেশি সাহেব তৈরির কারখানাও করতে চাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সত্যকারের মিলনতীর্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজকে। কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ হোক, এই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রঙিন স্বপ্ন ছিল।"[৬]

বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা চিন্তা ও কর্মপন্থাকে সংস্কৃত কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ভালো করেই জানতেন যে তৎকালীন বাঙালী সমাজের এক বৃহত্তর অংশ বিশেষ করে নারী সমাজ শিক্ষার আলো থেকে অনেক দুরে রয়েছে। এই বিষয়টিকে তিনি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার সময় পেয়েছিলেন সরকারের বিদ্যালয় পরিদর্শক রূপে বাংলার গ্রামীণ এলাকা গুলি পরিদর্শন কালে। বিবকানন্দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, একটি পাখি যেমন তার একটি ডানার সাহায্যে উড়তে পারে না, ঠিক তেমনি কোনো সমাজেও স্ত্রী জাতিকে বাদ দিয়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না। তাই নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তাঁর নারী শিক্ষার প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ ও কর্মপন্থা দেশবাসীর আনুকূল্য লাভ করেছিল। স্যার বার্টল ফিয়ারকে লেখা চিঠি গুলির মধ্যে দিয়ে তার একটি নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। চিঠিতে বিদ্যাসাগর লেখেন,

> "শুনিয়া সুখী হইবেন, মফঃস্বলের যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আপনি চাঁদা দিয়া ছিলেন, সেগুলি ভালই চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা সমূহের লোকেরা স্ত্রী শিক্ষার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে নূতন নূতন স্কুল খোলা হইতেছে।"[৭]

নভেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ১৩০০ জন বালিকা পড়াশুনার জন্য ভর্তি হয়।[৮] তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় গুলির জেলা ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল—

বছর	হুগলী	বর্ধমান	মেদনীপুর	নদীয়া	মোট
১৮৫৭	০৭	০১	-	-	০৮
১৮৫৮	১৩	১০	০৩	০১	২৭

তথ্য সংগৃহীত : সংবাদ সাময়িক : উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (পর্ব-২), স্বপন বোস, অক্টোবর-২০০৩

রক্ষণশীল বাঙালী সমাজকে নারী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার জন্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের যাতায়াতের গাড়ির দুই পাশে তিনি কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষা নীয়াতি যত্নত : মনু সংহিতার এই উদ্ধৃতি খোদাই করানোর ব্যবস্থা করেন। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।[৯] তাই দেখা যায় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার যখন নব প্রতিষ্ঠিত নারী বিদ্যালয় গুলিকে সরকারি অনুদান প্রদান বন্ধ করে দিলেন, তখন তিনি সেগুলিকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভান্ডার গড়ে তোলেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়া বিদ্যালয় গুলির পরিকাঠামো ও পাঠ্যসূচী কীরূপ ছিল তার একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে ১৮৬২খ্রী: ১৫ ডিসেম্বর বেথুন বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা রিপোর্ট থেকে। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে—

> "পঠন ও লিখন, পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সুচিকার্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, দুইজন সহকারিনী এবং দুইজন পন্ডিত এই পাঁচজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক।"[১০]

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে তৎকালীন বাংলাতে নারীশিক্ষার প্রসার বহুগুন বৃদ্ধি পায় এবং বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলত তাঁর এই কর্ম পরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে এবং তাঁর উদ্যমী প্রচেষ্টাকে আরো বৃদ্ধি করে। নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের পদক্ষেপ গুলির প্রভাব, বর্তমান দিনের নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচিতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১. সাম্প্রতিক কালে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও', 'কন্যাশ্রী', সরকারি চাকুরীতে আসন সংরক্ষন প্রভৃতি জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের এই আধুনিক প্রকলপগুলিতেও বিদ্যাসাগরের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়, তাঁর নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভান্ডার থেকে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে।

২. নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য সাম্প্রতিক কালে সরকার নারীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে চলেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ থেকে অনেকদিন আগেই মেয়েদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এই নজির গড়ে দিয়ে গেছেন।

শিশু শিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিশুদের জন্যও গ্রন্থ রচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি মহান কাজ। ১৯৫১ সালে ইংরেজি বই নানা বিষয় সংগ্রহ করে শিশুদের জন্য রচনা করলেন 'বোধোদয়'। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রচনা করলেন– 'সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা' (১৮৫১)। চারটি খণ্ডে রচনা করলেন 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১ম-১৮৫৩, ২য়- ১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৪, ৪র্থ- ১৮৬২)। এছাড়াও ১৯৬৪ সালে 'শব্দ মঞ্জরী' নামে বাংলা অভিধান রচনা করলেন। শিশুদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে দুটি গ্রন্থ রচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা হলো 'বর্ণ পরিচয়' (প্রথম ভাগ-১৮৫৫, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫)। শিশুদের জন্য রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো- 'কথামালা' (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), 'নীতি-বোধ' ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ব শিক্ষার ইতিহাসে বনেদি শিক্ষার প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও, তিনি বাংলা তথা ভারতের উচ্চশিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, সে বিষয়ে আমরা পূর্বেই আভাস পেয়েছি, বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি একটু অন্য পথে হাঁটলেন। এক্ষেত্রে তিনি বেসরকারি পথকে বেছে নিলেন কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন যে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একসঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে হয়তো তিনি মেকলের ধারণাকেই পোষণ করেছিলেন এবং সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারি পথে হেঁটেছিলেন। তাই ১৮৭২ খ্রী: তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন, এটি ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রথমদিকে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলাবিভাগে পঠন-পাঠন শুরু করেছিল।[১১] উচ্চশিক্ষার প্রসারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আগে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার, এটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলে পূর্বেই ২০ টি মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং শিক্ষক- শিক্ষনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এই আধুনিক পদক্ষেপ ও নীতিগুলির চিহ্ন আজকের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোতে পরিলক্ষিত হয় বিবর্তিত রূপে ও নামে। এখানে তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হল—

১. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বের পাঠক্রমে ভাষাশিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। উক্ত বিষয়গুলো পাঠদানের গুরুত্ব কতখানি তা জানতে পেরেছিলেন বলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঊনবিংশ শতকেই সেগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

২. আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষব্যবস্থা হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হয়, শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণভাবে শিখনে সাহায্য করার জন্য। এই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি তদারকি করেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন নামক প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য এই আধুনিক পদ্ধতিটি অধিক জনপ্রিয় হলেও, এর ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে।

৩. দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল আসেসমেন্ট এন্ড আক্রেডিটেশন কাউন্সিল। এর কাজ হল দেশের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো, শিক্ষন পদ্ধতি, শিক্ষার মান পরিমাপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি তদারকি করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এই আধুনিক পদ্ধতিটির জন্মদাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও একই উদ্দেশ্য নিয়েই স্কুল পরিদর্শন ও সেগুলির অবস্থান অনুযায়ী সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়, এই ধারণাটি বিদ্যাসাগরের মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনিও তৎকালীন সময়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংস্কৃত কলেজে প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন।

৫. আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে মাতৃভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষায় পাঠদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিভাষা শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। বিদ্যাসাগর তাঁর সময়কালে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার উপর জোর দিয়েছিলেন তাই পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলিকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। আবার মাধ্যমিক স্তরে বাংলা,সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা শিখনের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ত্রিভাষা পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন, হয়তো তৎকালীন সমাজের সমর্থন আদায়ের জন্য।

৬. বর্তমান সময়ে পুঁথিগত শিক্ষার চর্চার সাথে সাথে আধুনিক পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক ও ভোকেশনাল এডুকেশনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যাসাগরও তাঁর সময়কালে ভোকেশনাল এডুকেশনকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং

শিক্ষা অর্জনের শেষে তাদের যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয় মডেল স্কুলগুলিতে, তার জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন।[১২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সারাজীবন ব্যাপী শিক্ষা সম্পর্কিত নানা সিদ্ধান্ত নেন যা আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়। তিনি শুধু নারীশিক্ষার উপর জোর দিয়ে থেমে থাকেননি। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে কর্মাট্যাঁড়ে সাঁওতাল জনজাতির উপর শিক্ষার জোর দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর শেষ জীবন কাটিয়ে ছিলেন বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কর্মাট্যাঁড় নামক স্থানে। সেখানে বসবাস কারির অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল জনজাতির। এই সব অনুন্নত জাতিকে কিভাবে সমাজের মুলস্রোতে নিয়ে আশা যায় তা নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তা করতেন। তিনি নিজে আর্থিকদিক দিয়ে ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দ্বারা সাহায্য করতেন। এই সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তা বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্যকে এক নবরূপে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি আমাদের নিকট অধিক পরিচিতি লাভ করলেও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসেও তাঁর গুরুত্বপূর্ন অবদান রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ও মননশীল চিন্তাধারার প্রয়োগ করে একটি অদম্য ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর শিক্ষামূলক নীতি ও কর্মপন্থাগুলির ভিত্তিতে তিনি ছিলেন একজন সারগ্রাহী একটি প্রতীকী, যিনি বিভিন্ন দার্শনিককে সংশ্লেষণ ও সংহত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি সন্তানের লালন-পালনের লক্ষ্য রেখেছিলেন, যিনি প্রগতিশীল, উদার ও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠবেন। তিনি তাঁর এই মহান পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়নে শিক্ষকদের আরো বেশি করে ভূমিকা নিতে সহায়তা করেন। তাদের নিজেদের জীবনের ঘটনা ও পরিস্থিতির গভীর অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা সত্যই এক গৌরবময় কীর্তি ও স্বপ্নাদর্শী। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল সমাজের দুর্দশাগুলিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। আর এই কারণেই তিনি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রের ওই বিপ্লবাত্মক কর্ম প্রয়াসগুলির চিহ্ন আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত পরিশীলিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একথা নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা হল ঊনবিংশ শতকের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মননশীল চিন্তাভাবনার ফসল।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, বিমান, প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৭৪
২. উমর, বদরুদ্দীন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, প্রথম ভারতীয় সংস্করণের তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৪-৪৬
৩. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ইতালীয় রেনেসাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৭
৪. ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ জার্নাল, ভলিয়ম-৩, এপ্রিল-২০১৭, পৃ. ১২৪
৫. তদেব, পৃ. ১২৪
৬. ঘোষ, বিনয়, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাক সোয়ান লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭১
৭. ঘোষাল, মন্দিরা (সম্পাদক), শিক্ষাদর্পন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, জুন, ২০১৯, পৃ. ৩২
৮. তদেব, পৃ. ৩২
৯. তদেব, পৃ. ৩১
১০. তদেব, পৃ. ৩২
১১. ব্যানার্জী, অনির্বান, ওয়াজ বিদ্যাসাগর আ ফেলিওর এজ আ সোশ্যাল রিফর্মার? (সেমিনার পেপার),

৩১.০৮.২০১৯, পৃ. ৭

১২. ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ জার্নাল, ভলিয়ম-৩, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ১২৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাগাল, যোগেশচন্দ্র, ব্রহ্মমাধব উপাধ্যায়, সাধক চরিত মালা –১০০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৭১

২. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, তিন সংস্কারক, উনিশ শতকের বাঙ্গালীজীবন ও সংস্কৃতি, সম্পাদনা : স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩

পত্রিকা :

১. রায়, অনুরাধা, বিদ্যাসাগরের আয়নায় বাঙালী, অরেক রকম, সম্পাদনা : শুভনীল চৌধুরী, সপ্তম বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৯

২. জিজ্ঞাসা, ৩য়- ৪র্থ সংখ্যা, রেনেসাঁ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৩-২০১৪